শরণার্থীদের হাত ধরে এসেছে মোমো

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই বদলায়। কখনও পরিবর্তন আসে অভ্যাসে। আবার কখনও অভ্যাস মেটানোর উপকরণে। একসময় সান্ধ্যকালীন নাস্তা মানেই ছিল ভাজাপোড়া। দেশের মানুষের সঙ্গে এই মশলাদার খাবারগুলোর সম্পর্ক লম্বা সময় ধরে। তবে আজকাল স্বাস্থ্যসচেতন মানুষ নাস্তার টেবিলে রাখেন না তেলে ভাজা খাবার। আজকাল সান্ধ্যকালীন নাস্তার উপকরণে যোগ হয়েছে স্ন্যাকস মোমো। নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সিদ্ধ ময়দার ছোট ছোট খোলে ভরা মাংসযুক্ত খাবার। **হাসান নীলের** প্রতিবেদন

নেপাল থেকে তিব্বত, না কি তিব্বত থেকে নেপাল

কেউ কি কখনও ভেবেছি মোমো নামের স্ন্যাকসটি কোথা থেকে এলো, কেইবা আনল এ দেশে। মোমোর অদ্যোপান্ত জানতে হলে আমাদের যেতে হবে ১৪০০ বছর আগে। সেসময় তিব্বতে আবিষ্কৃত হয় এ খাবার। তবে উৎপত্তিস্থল তিব্বত হলেও মাংসের কিমা ভরা এই মোমো সামনে নিয়ে আসার কৃতিত্ব নেপালের। তিব্বতে সাধারণত মোমো বানাতে ব্যবহার করা হতো চামরি গাভির মাংস। তখন মোমো ওই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেসময় নেপালে বাস করত 'নেওয়ার' নামে এক জাতি। তাদের অনেকেই ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

নেওয়ার ব্যবসায়ীরা তিব্বতের চামরি গাভির মাংসের কিমায় তৈরি মোমোর স্বাদ আস্বাদন করেই মুগ্ধ হয়ে যান। তারা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে তিব্বতিদের কাছ থেকে মোমো কিনে আনেন। এরপর তা নিজেদের দেশে বিক্রি শুরু করেন। খাবারটি নতুন ও সুস্বাদু হওয়ায় অল্পদিনেই বেশ পরিচিতি পেয়ে যায়। মোমোর জোগান দিতে নতুন পরিকল্পনা করেন নেওয়াররা। তিব্বত থেকে আনার ঝক্কি এড়াতে নিজেরাই তৈরির উদ্যোগ নেন। এই উদ্যোগের প্রথমেই তারা বাদ দেন চামরি গরুর মাংস। সেসময় নেপালে সহজলভ্য ছিল মহিষ। ব্যবসায়ীরা চামরি গরুর বিকল্প হিসেবে মহিষের মাংস বেছে নেন।

মহিষের মাংসের কিমা দিয়ে তৈরি ওই মোমো দিয়েই তিব্বতের উপর নির্ভরশীলতা কাটান নেওয়াররা। অল্পদিনেই জনসাধারণের মন জয় করে নেয় এটি। অন্যরাও খুলে বসে মোমোর দোকান। নেপালের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এই খাবার। তবে ব্রাহ্ম ও ছেত্রি সম্প্রদায়ের লোকজন ছুঁয়েও দেখতেন না এই মোমো। এর একমাত্র কারণ ছিল মহিষের মাংস। তারা মহিষের মাংস বর্জন করে চলতেন। ব্রাহ্ম ও ছেত্রিদের বিমুখতা এই স্ন্যাকসের জনপ্রিয়তা কমাতে পারেনি। সেসময় নেপালের শীর্ষস্থানীয় খাবার বলে বিবেচিত হতো এটি।

অনেকে অবশ্য মোমোর উৎপত্তি সংক্রান্ত এই তথ্যের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা মনে করেন, মোমোর জন্ম তিব্বতে নয় বরং নেপাল থেকেই তিব্বতে এসেছে মোমো। এর কৃতিত্ব দেশটির এক রাজকুমারীর। ওই রাজকুমারীর বিয়ে হয়েছিল তিব্বতের এক রাজার সঙ্গে। বাবার বাড়ি থেকে স্বামীর বাড়ি যাওয়ার সময় রাজকুমারী সঙ্গে করে নিয়ে যান ময়দার আস্তরে ভরা মাংসের কিমাযুক্ত খাবারটি। এরপর থেকেই তিব্বতে ছড়িয়ে পড়ে এটি।

নেপালে মোমোর বেশ চাহিদা রয়েছে

শুরুতে নেপালে মোমোর এতটাই বিস্তৃতি ঘটে যে, দেশটির বাসিন্দারা এটি সকালের নাস্তার টেবিলেও রাখতেন। দেশটি এই জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছিল নব্বই দশক পর্যন্ত। ততদিনে রাজধানী কাঠমান্ডুতেও মোমো জনপ্রিয় হয়ে উঠে। কাঠমান্ডুর সীমানা ছাড়াতেও বেশিদিন লাগেনি। কারণটা খুব স্বাভাবিক। কাঠমান্ডু নেপালের রাজধানী। সেখানে বিভিন্ন দেশ থেকে হরহামেশা আসা-যাওয়া ছিল মানুষের। ফলে ভিনদেশিদের নজরে পড়তে সময় লাগেনি। পরবর্তী সময়ে তাদের হাত ধরেই মোমো ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দেশে।

শরণার্থীদের হাত ধরে ভারতে আসে মোমো

ভারতে মোমোর প্রসারে ভূমিকা রয়েছে তিব্বতি শরণার্থীদের। জনশ্রুতি আছে, ১৯৬০ সালে প্রচুর সংখ্যক তিব্বতি ভারতে পালিয়ে আসতে থাকে। তারা আশ্রয় হিসেবে বেছে নেয় লাদাখ, দার্জিলিং, সিকিম, ধর্মশালা অঞ্চলগুলো। ফলে ওই জায়গাগুলোতে প্রথম দেখা যায় মোমো। তবে ভারতে মোমোর বিস্তৃতি নিয়ে আরও একটি গল্প রয়েছে। শোনা যায়, সেসময় কাঠমান্ডুর 'নেওয়ার' ব্যবসায়ীরা ভারত ভ্রমণের সময় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন তিব্বতি এই স্ন্যাকসের রেসিপি। অনেকে মনে করেন, ওই ব্যবসায়ীদের আনা রেসিপির মাধ্যমে ভারতজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে মোমো। প্রথমে জনপ্রিয়তা পায় লাদাখ, সিকিম, ধর্মশালা, দিল্লির দিকে। পরে নিজ গুণে তা ছড়িয়ে পড়ে পুরো দেশে।

উপকরণে বৈচিত্র্য

আদি মোমোর সঙ্গে ভারতে ছড়িয়ে পড়া মোমোর উপকরণে ভিন্নতা রয়েছে বেশ। তিব্বতি মোমোতে চামরি গাভির মাংস ব্যবহৃত হতো। ভারতে আসার পর বৈচিত্র্য আসে এর উপকরণে। ময়দার খোলে মাংসের স্থান দখল করে নেয় সবজি, মুরগির মাংসসহ বিভিন্ন উপকরণ। কারণ হিমালয়ের কাছের দেশ নেপাল ও তিব্বতে শাক সবজির খুব অভাব ছিল। অগত্যা মোমো তৈরিতে মাংসের ওপরই নির্ভর করতে হতো তাদের। অন্যদিকে ভারত ছিল সুজলা সুফলা। তাই দেশটিতে আসতেই মাংসের কিমার পাশাপাশি অন্যান্য উপকরণও যোগ হতে থাকে এর সঙ্গে।

ফ্রায়েড মোমো

এতকাল মোমো বাষ্পে সিদ্ধ করে বানালেও কালে কালে এর রন্ধন পদ্ধতিতেও এসেছে পরিবর্তন। তারই ধারাবাহিকতায় আজকাল ভেজেও মোমো বানানো হয়। এগুলোকে বলে ফ্রায়েড মোমো। স্ন্যাকসটির যত ধরনের রূপান্তর তার প্রায় সবই হয়েছে ভারতে আসার পর।

উৎপত্তি ও নামকরণে চীনের সঙ্গে মিল

ভারতের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে এখন মোমোর বিচরণ। চীন, জাপান, কোরিয়াসহ পৃথিবীর প্রায় দেশেই এটি এখন বেশ প্রসিদ্ধ স্ন্যাকস। তবে উৎপত্তির দিক থেকে এর সঙ্গে মিল পাওয়া গেছে চীনা খাবারের। বাওজি ও জিয়াউজ নামে দুটি খাবার খেয়ে থাকে চীনারা। মোমোর সঙ্গে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে এগুলোর। শুকর বা গরুর মাংস, শাক সবজি দিয়ে তৈরি করা হয় খাবারগুলো। যা দেখতে অনেকটা মোমোর মতোই। এ থেকে ধারনা করা হয়, মোমো নামটি চীন দেশ থেকেই ধার করা হয়েছে। এর আরও একটি বিশ্বাসযোগ্য সূত্র হলো, উত্তর-পশ্চিম চীনে এক ধরনের রুটি বানানো হয়। গমের সিদ্ধ ওই রুটিকে সেখানের আঞ্চলিক ভাষায় বলা হয় মোমো।

মোমো তৈরির রেসিপি

উপকরণ

চিকেন কিমা ১ কাপ, ময়দা ১ কাপ, আদা বাটা ১/৪ চা চামচ, রসুন বাটা ১/৪ চা চামচ, গোল মরিচ গুঁড়া ১/৪ চা চামচ, সয়া সস ১ চা চামচ, পেঁয়াজ বাটা ১/২ চা চামচ, পানি ১/৪ কাপ, তেল ১ টেবিল চামচ, লবণ (পরিমান মতো)

প্রণালি

প্রথমে ময়দা তেল আর লবণ দিয়ে ভালো করে মাখতে হবে, ময়ান যত ভালো হবে মোমো তত নরম হবে। এবার প্যানে তেল দিয়ে একটু গরম করে তাতে কিমা আর বাকি সব কিছু একে একে দিয়ে একটু নেড়ে নামাতে হবে। একটি বাটিতে কিমা ঢেলে ঠান্ডা করতে হবে। এবার ময়দা মাখা দিয়ে লুচির মতো ছোট ছোট লেচি কেটে বেলতে হবে আর তার ভিতর একটু করে কিমার পুর দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হবে। এরপর চুলায় স্টিমারে পানি দিয়ে ফুটতে দিতে হবে। পানি ফুটে উঠলে তাতে মোমোগুলো সাজিয়ে ঢাকনা দিয়ে ১০/১২ মিনিট ভাপ দিতে হবে। ভাপ হয়ে গেলে প্লেটে সাজিয়ে গরম গরম সস বা চাটনি দিয়ে পরিবেশন করুন চিকেন মোমো।

বাংলাদেশে মোমো

ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী হওয়ায় সাংস্কৃতিক দিক থেকে শুরু করে অনেক ক্ষেত্রেই দুটি দেশে রয়েছে মিল। মোমো যেন তারই উদাহরণ। এই স্ন্যাকস ভারতে ছড়িয়ে পড়ার পর এসেছে বাংলাদেশে। ভোজনরসিক শহরবাসী চাইনিজ চাউমিনসহ নানান ফাস্টফুড খেলেও যখন খাবারে বৈচিত্র্য খুঁজছেন ঠিক তখন আবির্ভাব হয়েছে নেপালি বা তিব্বতি এই স্ন্যাকসের। পশ্চিমাদের ফাস্টফুডের ভিড়ে নতুন কিছুর স্বাদ পেয়েছেন তারা। ফলে বিকেলের নাস্তার টেবিল, অতিথি আপ্যায়ন বা বন্ধুদের আড্ডায় সিদ্ধ ময়দার আস্তরে ভরা মাংস বা সবজির স্ন্যাকসটি বেশ সমাদর পাচ্ছে। ঢাকার অভিজাত এলাকা বনানী থেকে পুরান ঢাকার ওয়ারী যেখানেই যাবেন সেখানেই পাবেন মোমো। এই সহজলভ্যতাই প্রমাণ করে এর প্রসার। দেশে এখন হরেক রকম মোমোর ছড়াছড়ি। এরমধ্যে গরুর মাংস, চিজ, সবজি, চিংড়ি এবং চকলেট মোমো উল্লেখযোগ্য।

তবে শুধু ঢাকার রেস্তোরাঁ বা ফুডকোর্টেই সীমাবদ্ধ নেই, ফুটপাথের খাবারের দোকানেও পাওয়া যায় মোমো। বিকেলে শহরের ফুটপাথে ছোট ছোট ভ্রাম্যমান গাড়িতে করে বিক্রি হচ্ছে মোমো। এসব গাড়িতেই রয়েছে মোমো তৈরির ব্যবস্থা। ফলে তৈরি প্রক্রিয়াও দেখা যায়। স্ন্যাকটির তৈরির পাত্রকে বলা হয় মাকটু। আধুনিক মাকটু কয়েক তলা বিশিষ্ট। ঢাকনাওয়ালা স্টিলের গোল মাকটু চুলায় বসানো হয়। দেখতে কয়েক তলা বাটির মতো মাকটুতে ভাপে তৈরি করা হয় ছোট সাদা মোমো। ঢাকার রাস্তায় মোমোর সঙ্গে দোকানিরা পরিবেশন করেন টমেটো সস, ধনেপাতার চাটনি, তেঁতুলের চাটনি, শুকনা মরিচ ও তেল দিয়ে তৈরি সস। বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশের মোমোর আকৃতিতে রয়েছে বৈচিত্র্য। অর্ধচন্দ্রাকৃতি, গোল, কলসাকৃতি, বরফি, পাতা নানা আকারে বানানো হয় এগুলো।